কীটনাশক বাণিজ্য ও আমাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতা

ইসতিয়াক রায়হান

আমরা বাংলাদেশে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দেখি, প্রতিদিন সরকারের সাফল্যের বয়ান শুনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বাজার ভরে থাকে চকচকে রঙিন ফলমূল সবজি। জিডিপি বাড়ে, ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ে। কিন্তু আড়াল হয়ে থাকে এর পেছনের বিষাক্ত জগত। দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধির তাগিদে, ক্রেতাদের বেশি বেশি আকৃষ্ট করতে, বিক্রি বাড়াতে, মুনাফা বৃদ্ধির উন্মাদনায় ব্যবহার হতে থাকে, ব্যবহার বাড়তে থাকে নানা কীটনাশক ও রাসায়নিক দ্রব্য। এর নির্বিচার ব্যবহার পানিসম্পদসহ পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কীভাবে এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ভোক্তার সাথে সাথে উৎপাদককেও দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে সে সম্পর্কে খুব কমই কথাবার্তা হয়। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ে পর্যালোচনা ছাড়াও মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে।

জাপানি কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক, লেখক ও দার্শনিক, ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের জনক হিসেবে পরিচিত মাসানোবু ফুকুওকা (১৯১৩-২০০৮) কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার অস্বীকার করে বলেছেন, *'পোকায় খাওয়ার পর যতটুকু ফসল অবশিষ্ট থাকবে ততটুকুই আমি খাব'* এবং তিনি দেখিয়ে গেছেন কিভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করেই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায়। পোকা বাঁচানোর জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদের বাঁচানোর জন্যই এখন কীটনাশকমুক্ত চাষাবাদের কোনো বিকল্প নেই। কেননা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এবং এর বাইরেও কমপক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং কমপক্ষে দুই লক্ষ মানুষ এর কারণে মৃত্যুবরণ করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশ্বের ৩০ শতাংশ কীটনাশক ব্যবহৃত হলেও কীটনাশকজনিত কারণে সংঘটিত মৃত্যুর ৯৫ শতাংশই সংঘটিত হয়ে থাকে এসব দেশে (মুহাম্মদ, ২০১৪)। বাংলাদেশের কৃষিতেও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এবং যথাযথ নিয়ম না মানায় দেশের অধিকাংশ মানুষই এখন রয়েছে চরম স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের কৃষিতে কীটনাশকের আবির্ভাব ষাটের দশকে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমা দেশের প্রেসক্রিপশনে 'সবুজ বিপ্লব' নামে যে দর্শন কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার হাত ধরেই এদেশে আগমন ঘটে কীটনাশকের। সবুজ বিপ্লবের নামে প্রথমে অত্যন্ত কম দামে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় উফশী বীজ এবং এই বীজ চাষাবাদের জন্য ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের কাছে সরবরাহ করা হয় রাসায়নিক সার ও সেচ সুবিধা এবং দুর্বল জীবনীশক্তির এসব ফসল বাঁচানোর জন্য আমদানি হতে থাকে কীটনাশক বিষ। সবুজ বিপ্লবের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো সবুজ বিপ্লবের পূর্বে বীজের মালিকানা ছিল কৃষকের। কৃষক দেশীয় পদ্ধতিতে দেশীয় বীজের চাষাবাদ করত, তাই উৎপাদন খরচও ছিল হাতে গোনা। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের পর কৃষক হারাল তার বীজের মালিকানা, দেশীয় বীজের স্থলে আমদানি শুরু হলো বহুজাতিক বীজ কোম্পানির পরিকল্পিত বীজ এবং সেই সাথে আমদানি শুরু হলো সেই বীজ চাষাবাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের, অর্থাৎ আমাদের কৃষিব্যবস্থা পরিণত হলো অন্য আরো অনেক দেশের মতো বীজ, সার ও কীটনাশক প্রস্তুতকারী কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির অ্যাকুরিয়ামে পোষা মাছের মতো।

ষাটের দশকে যে কৃষি রাসায়নিক বাজারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সেটি এখন কমপক্ষে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশ্ববাণিজ্য। মাত্র ১০টি কোম্পানি পৃথিবীর কীটনাশক বাণিজ্যের ৮৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে জার্মানির বেয়ার ১৯ শতাংশ, সুইজারল্যান্ডের সিনজেনটা ১৯ শতাংশ, জার্মানির বিএএসএফ ১১ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের ডো এগ্রো সাইন্স ১০ শতাংশ, মনসান্টো ৯ শতাংশ ও ডুপন্ট ৬ শতাংশ অর্থাৎ জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র– এই তিনটি দেশের ৬টি কোম্পানি বিশ্বের কীটনাশক বাণিজ্যের ৭৪ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে (ইটিসি গ্রুপ, ২০০৮)।

১৯৫৬ সালে তৎকালীন সরকারের প্ল্যান্ট প্রোটেকশন উইং প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ভূখণ্ডে দুই টন কীটনাশক আমদানি করে (আহম্মেদ, ২০১৩)। তার পর থেকে বছরের পর বছর এই আমদানির পরিমাণ শুধু বৃদ্ধিই পেয়েছে। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশ সরকার কৃষিকে নতুন করে ঢেলে সাজায়নি। আবহমান কাল থেকে যেভাবে চাষাবাদ হয়ে এসেছে তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে দেশীয় বীজের আরো উৎকর্ষ সাধন করে একটি টেকসই কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন না করে পাকিস্তান আমলে গৃহীত পরিকল্পনার পথ ধরেই এগিয়েছে বাংলাদেশের সব সরকার। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কীটনাশকের ক্ষেত্রে শতভাগ ভর্তুকি দিয়েছে সরকার এবং কৃষকদের মাঝে কীটনাশকের ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের প থেকে স্লোগানও ছিল 'বোকার ফসল পোকায় খায়'(ফারুক, ২০১৫)।

ষাটের দশকে যে কৃষি রাসায়নিক বাজারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সেটি এখন কমপক্ষে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশ্ববাণিজ্য। মাত্র ১০টি কোম্পানি পৃথিবীর কীটনাশক বাণিজ্যের ৮৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রচারণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে কীটনাশক ব্যবহারের। কিন্তু ১৯৭৪ সালে কীটনাশকের ওপর ভর্তুকি কমিয়ে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয় এবং ১৯৭৯ সালে ভর্তুকি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৯৮০ সাল থেকে বেসরকারি খাতে কীটনাশক আমদানি অনুমোদিত হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কীটনাশকের ভর্তুকি কমানোর পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়, এগুলো ক্ষতিকর বিষ, তাই পরিমিত ব্যবহারের জন্য সরকার ভর্তুকি তুলে নিয়েছে। (আহম্মেদ, ২০১৩) অথচ এই ক্ষতিকর বিষ আমদানি ও কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার কাজটি সাধন করেছে সরকারি লোকজনই। প্রথমে বিনা মূল্যে সরবরাহ করে কৃষকদের অভ্যস্ত করা হয়। আর উফশী বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি ও কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরিহার্য রূপ ধারণ করে কীটনাশকের ব্যবহার। পক্ষান্তরে ভর্তুকি উঠিয়ে কীটনাশকের আমদানি বেসরকারি খাতে দিয়ে এর ব্যবসার

পথ আরো সম্প্রসারণ করা হয়। যার ফলে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে কীটনাশকের ব্যবহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৮৫-৮৬ সালে ব্যবহৃত কীটনাশকের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৬৩ মেট্রিক টন, যা ১৯৯০-৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৯৪৮ মেট্রিক টনে। ১৯৯৭ সালের মধ্যে কীটনাশকের ব্যবহার দাঁড়ায় ৮ হাজার মেট্রিক টনে, ২০০০ সালে তা হয় ১৬ হাজার মেট্রিক টনে, ২০০৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ হাজার মেট্রিক টনে এবং ২০০৮ সালে তা হয় ৪৮ হাজার ৬৯০ মেট্রিক টনে (এগ্রো নিউজ, ২০১০) । অর্থাৎ ২০০০ থেকে ২০০৮– এই আট বছরে কীটনাশকের ব্যবহার প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে ৬২টি কোম্পানি কীটনাশক আমদানি, রি-প্যাকিং, বিপণন ও বাজারজাত করে থাকে (আহম্মেদ, ২০১৩)।

বাংলাদেশে যে পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তার সবই বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের বালাইনাশক প্রশাসন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখা বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮ ধরনের ৭১টি মাকড়নাশক, ৩৫ ধরনের ২৪৪টি ছত্রাকনাশক, ৫৩ ধরনের ৬৮৮টি কীটনাশক, ২২ ধরনের ১২২টি আগাছানাশক, ২ ধরনের ১০টি ইঁদুরনাশক বাজারে রয়েছে; তা ছাড়াও ১ ধরনের ৬৮টি নেমাটোডনাশক ও স্টোরড গ্রেইন পেস্ট বা গুদামজাত শস্যের পোকা দমনের জন্য ৩ ধরনের ২৮টি বিশেষ কীটনাশক রয়েছে (আহম্মেদ, ২০১৩)। এ ছাড়াও প্রতিবছর চোরাপথে ভারত থেকে আসছে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক, যেগুলো পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর কিন্তু দামে সস্তা এবং দ্রুত কাজ দেওয়ার কারণে এগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। চোরাপথে আসা আজানল, গামাকসিন, হিলটন কীটনাশকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভয়াবহ ও দীর্ঘমেয়াদি। ৬০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়ও এদের বিষক্রিয়া নষ্ট হয় না। ভারতের তৈরি কীটনাশক হিলডন ও হিলটন তুলা ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও বাংলাদেশে সব ধরনের ফসলে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে(পূর্বোক্ত)।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৮ ধরনের ৭১টি মাকড়নাশক, ৩৫ ধরনের ২৪৪টি ছত্রাকনাশক, ৫৩ ধরনের ৬৮৮টি কীটনাশক, ২২ ধরনের ১২২টি আগাছানাশক, ২ ধরনের ১০টি ইঁদুরনাশক বাজারে রয়েছে;

বিষে ভরা খাদ্য

আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণা পরিষদের এক গবেষণায় বিভিন্ন ফল, সবজি, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার ও শুঁটকি মাছে জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর বেশ কিছু নিষিদ্ধ সার ও কীটনাশকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন খাদ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান থাকার যে সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে, গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা খাদ্যগুলোতে তার চেয়েও ৩ থেকে ২০ গুণ বেশি বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত ৮২টি নমুনা খাদ্যের মধ্যে ৪০ শতাংশ খাদ্যেই এমন সব কীটনাশক পাওয়া গেছে, যেগুলো প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। উচ্চমাত্রায় বিষাক্ত উপাদানের অস্তিত্ব পাওয়ায় এসব কীটনাশক ফসলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অতি বিষাক্ত আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ এসব কীটনাশককে ডার্টি ডজন নামে অভিহিত করা হয়।

ডার্টি ডজনের বর্তমান সংখ্যা ১৮, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডিডিটি, হেপ্টাকোর, কোরাডেন, অলড্রিন, ডিয়েলড্রিন, কেমফাক্লোর, লিনডেন, ২-৪ ডি, এলডিফার্ব, পেন্টাকোরোফেনল, মেথক্সি ইথানল, মারকারি কোরাইড এবং ইথাইলিন ডাইব্রোমাইড। গবেষণায় গাজর, শিম, টমেটো, লেটুসপাতা, ক্যাপসিকাম, কলা, আপেল, আনারস, আমসহ বিভিন্ন ফল ও সবজি নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং অনেকগুলোতেই উচ্চমাত্রার বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। গবেষণায় নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত সবজির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ফলের মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশতেই তিকর রাসায়নিক কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এছাড়া চালের ১৩টি নমুনায় মিলেছে মাত্রাতিরিক্ত বিষক্রিয়াসম্পন্ন আর্সেনিক, ৫টি নমুনায় পাওয়া গেছে ক্যাডমিয়াম (প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০১৫)। আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির (এসিএস) গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের চালে প্রতি কেজিতে ক্যাডমিয়াম রয়েছে দশমিক ০১ থেকে দশমিক ৩ পিপিএম পর্যন্ত এবং এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে(দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ জুন ২০১৩)। ভেজাল টিএসপি সার এবং শিল্প বিশেষ করে ট্যানারির বর্জ্যে উচ্চমাত্রার ক্যাডমিয়াম রয়েছে। ক্যাডমিয়াম এক ধরনের ক্ষতিকর ভারী ধাতু। এটি শরীরে দীর্ঘদিন জমা থাকলে ক্যান্সার হতে পারে এবং কিডনি আক্রান্ত হতে পারে।

২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের ১২টি জেলার বিভিন্ন বাজার থেকে সংগৃহীত ৪৫৪টি নমুনা পরীক্ষা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) 'খাদ্যে কীটনাশকের অবশেষ: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শিরোনামে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরীক্ষায় ব্যবহৃত নমুনাগুলোর ২৩ শতাংশে ক্ষতিকর মাত্রায় কীটনাশক পাওয়া যায়। শুঁটকির ৪৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে ৭৪ শতাংশে পাওয়া যায় ডিডিটি, অ্যালড্রিন ও ডিয়েড্রিনের মতো আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ বিষাক্ত কীটনাশক। এছাড়া কাঁচামরিচে ৯১ শতাংশ এবং বেগুনে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত অর্গানোসালফারের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই অর্গানোসালফার মানবদেহের জন্য এতটাই ক্ষতিকর যে একসঙ্গে মাত্র ৫ গ্রাম পরিমাণ খেলেই মৃত্যু অনিবার্য (আমাদের সময়, ৭ জুলাই ২০১৫)।

৮ জুন ২০১৪ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠে 'মানবদেহের নতুন বিপদ কার্বামেট' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আর্সেনিকের মতো মানবদেহে ক্ষতিকর বিষক্রিয়া ছড়াচ্ছে কার্বামেট। ফসলে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এ ধরনের ভয়াবহতা সৃষ্টি হচ্ছে। কার্বামেট খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া তৈরি করছে। সম্প্রতি মানুষের শরীরে এবং পানিতে পাওয়া গেছে এই বিষাক্ত দ্রবণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্বামেটের ভয়াবহতা আর্সেনিকের মতোই। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবার রহমান এ বিষয়ে বলেন, *"বাংলাদেশে যত ধরনের কীটনাশক ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে গড় হিসাবে সবচেয়ে বেশি বা প্রায় ৩০ শতাংশই এই কার্বামেট জাতীয় কীটনাশক।"* তিনি আরো জানান, এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে টিউবওয়েলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত কার্বামেট পাওয়ায় সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবে আমাদের দেশে এমন কোনো পর্যবেক্ষণ বা পদক্ষেপ নেই। তাছাড়া বাংলাদেশে মানবদেহে কার্বামেট পাওয়ার ঘটনা অনেকটাই নতুন।

২০০৯ সালে ধামরাইয়ে কৃষিনির্ভর গ্রাম মালঞ্চ ও নওগাঁর কুলা ইউনিয়নে কয়েকটি শিশুর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আরো বেশ কিছু শিশু। এসব ঘটনায় পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মৃত্যুবরণকারী ও অসুস্থ হয়ে পড়া বেশির ভাগ শিশুর রক্তে ও প্রস্রাবে কার্বামেট ও অর্গানোফসফেট নামক কীটনাশকের

উপাদান অবশেষ রয়েছে, যার বিষক্রিয়ায় তারা আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি কারো কারো মধ্যে বিষক্রিয়ার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ের চেয়ে ৬ থেকে ২৩ গুণ পর্যন্ত বেশি ছিল (কালের কণ্ঠ, ৮ জুন ২০১৪)।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ আণবিক শক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা রংপুরের পীরগাছা উপজেলার পানিতে কার্বামেট ও অর্গানোফসফেট জাতীয় কীটনাশকের উপাদানের বিষক্রিয়ার অস্তিত্ব পেয়েছেন। পীরগাছার ২৪টি সারফেস ওয়াটার এবং ৫টি গভীর নলকূপের পানি পরীা করা হয়। এ সময় এগুলোর পানিতে উচ্চমাত্রার কার্বামেট ও অর্গানোফসফেট জাতীয় কীটনাশক উপাদানের বিষক্রিয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে ধানতের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত কার্বোফুরান ও কার্বোরিলের উপাদান মেলে (কালের কণ্ঠ, ৮ জুন ২০১৪)।

দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব

কীটনাশক হিসেবে প্রায় সব ধরনের ফসলে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিষ। অধিকাংশ সময় তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষগুলোর বিষক্রিয়া অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু এগুলোর প্রভাব ১৫ দিন থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রতিদিনকার খাদ্যের সাথে এসব বিষ ধীরে ধীরে জমা হচ্ছে আমাদের দেহে, দীর্ঘ মেয়াদে রয়েছে যার ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাব। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিবেশ গবেষণা গ্রুপ ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশকের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তাই সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্যে কীটনাশকের অবশেষ থেকে যাওয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে মানবদেহের হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও কিডনি; বিস্তার ঘটছে ক্যান্সারের। এ ছাড়াও অন্ত্রে ব্যথা, বন্ধ্যাত্ব, শ্বাসকষ্ট, মাংশপেশির সংকোচন, স্নায়বিক দুর্বলতা, ফুসফুসের সমস্যা প্রভৃতিও কীটনাশকের বিষক্রিয়ার ফল। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক দূষিত করে তুলছে আমাদের পানিসম্পদ। ভূ-উপরস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত করে জনস্বাস্থ্যকে বিপজ্জনক করে তুলছে।

> প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নরসিংদী জেলার চরসিন্দুর, সুলতানপুর, চলনা, উত্তর ও দক্ষিণ সাধারচর, হরণখোলা, তালতলী, গজারিয়া–এই ৭টি এলাকা নির্বাচন করে কৃষকদের সাথে কথা বলা হয়।

এই বিষাক্ত পানি ব্যবহার করে মানুষের স্নায়বিক দুর্বলতা, এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে(আহম্মেদ, ২০১৩)। হেলথ রিসোর্স ইনস্টিটিউটের মতে, কৃষিখামার ও উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ মৃত্যুর ঘটনা বিশেষ করে ক্যান্সার, সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য অসুস্থতা কীটনাশক থেকে ঘটছে। অতিরিক্ত কীটনাশক বন্যা ও বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদীনালা ও পুকুরে ছড়িয়ে পড়ে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজননমতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং ক্ষতরোগ সৃষ্টি করছে (পূর্বোক্ত)। কৃষিভূমিসংলগ্ন বাংলাদেশের পুকুর ও জলাভূমিগুলোতে ক্ষতিকর মাত্রায় অর্গানোফসফরাস, কার্বামেট, ফুরাডান, ম্যালাথিয়ন কীটনাশক বিদ্যমান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা অনুষদের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, মাছে ডায়াজিনন, ফুরাডান ও বাসুডিনের অবশেষ ক্ষতিকর মাত্রায় উপস্থিত (পূর্বোক্ত)।

প্রাকৃতিক বাস্থসংস্থানের ওপরও রয়েছে কীটনাশকের ভয়াবহ প্রভাব। অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে অত্যন্ত উপকারী প্যারাসাইট এবং ব্যাঙ ও সাপের মতো উপকারী পতঙ্গভোজী প্রাণী ও সরীসৃপ আজ বিলুপ্তির পথে। কীটনাশকের অধিক ব্যবহার কেবল ফসলের শত্রু পোকাই ধ্বংস করে না, অনেক উপকারী পোকাও ধ্বংস করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। কৃষিজমিতে এখন আর শামুক-ঝিনুক ও বিভিন্ন প্রকার ছোট মাছ চোখে পড়ে না। বিলুপ্তপ্রায় প্রকৃতির লাঙল কেঁচো। কমে যাচ্ছে কৃষিতে পাখির বিচরণ, বিলুপ্তির পথে অনেক সরীসৃপ। বাংলাদেশে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যে ১২ প্রজাতির সরীসৃপ ও ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আগামী ১০ বছরে আরো প্রায় ২৫ ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা(পূর্বোক্ত)।

ফসলের জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অব্যাহতভাবে কমে যাওয়ায় মাটিতে উপকারী অণুজীব আর বেঁচে থাকতে পারছে না। সাম্প্রতিক সময়ে ফসলের জমিতে আগাছানাশকের ব্যাপক ব্যবহার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে অব্যাহতভাবে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে নতুন প্রজাতির পোকার জন্ম হচ্ছে, যা প্রচলিত মাত্রার কীটনাশক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগাছানাশকের ব্যবহারের কারণে নতুন প্রজাতির আগাছার উদ্ভব ঘটবে, যা কোনোভাবেই দমন করা যাবে না। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে বর্তমানে তিন শর বেশি প্রজাতির কীট একাধিক কীটনাশক প্রতিরোধে সক্ষম (পূর্বোক্ত)। যার ফলে এদের দমনের জন্য মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটনাশক, যা আমাদের প্রতিদিনকার খাদ্যকে করে তুলছে আরো বিষাক্ত।

মাঠ সমীক্ষার পদ্ধতি

এই বিষয়ে মাঠ সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষক ও কীটনাশক বিক্রেতাদের কাছে পৃথক প্রশ্নাবলি ছিল, যেগুলোর উত্তরের ভিত্তিতে প্রাথমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নরসিংদী জেলার চরসিন্দুর, সুলতানপুর, চলনা, উত্তর ও দণি সাধারচর, হরণখোলা, তালতলী, গজারিয়া– এই ৭টি এলাকা নির্বাচন করে কৃষকদের সাথে কথা বলা হয়। মোট ১৫০ জন কৃষক ও ৭ জন কীটনাশক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণায় মূলত বের করার চেষ্টা ছিল–

* এলাকাগুলোতে কী কী ধরনের কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে, এগুলো যথাযথ নিয়ম মেনে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না।
* কোন কীটনাশক কোন ফসলের জন্য আমদানীকৃত এবং সেটা প্রকৃতপক্ষে কোন ফসলে ব্যবহৃত হচ্ছে।
* কীটনাশক প্রয়োগের কত দিনের মধ্যে ফসল তোলা ও খাওয়া নিষেধ এবং বাস্তবে মাঠপর্যায়ে কী হচ্ছে।
* কীটনাশক স্প্রে করার সময় যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কৃষক সেসব সতর্কতা অবলম্বন করেন কি না।
* কীটনাশকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কৃষক জানেন কি না এবং ব্যবহার না করার জন্য তাঁরা সচেতন কি না।
* কীটনাশক বিক্রেতারা অনেকটা ফসলের ডাক্তার হিসেবে কাজ করছেন, তাঁরা এসব কীটনাশক সম্পর্কে কতটুকু জানেন এবং কিভাবে জানেন।

কিছু তথ্যের জন্য সরাসরি কথা বলা হয় কৃষক ও কীটনাশক বিক্রেতার সাথে। নির্বাচিত এলাকাসমূহে যেসব কীটনাশক ব্যবহৃত হয় সেগুলোর কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যেগুলো টেবিলের সাহায্যে দেখানো হলো। সেখানে রয়েছে কীটনাশকের নাম, মূল উপাদান, প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম, বাংলাদেশে পরিবেশক ও বাজারজাতকারীর নাম, কীটনাশকের গায়ে লেখা সতর্কতা ও প্রয়োগক্ষেত্র এবং বাস্তবে বিক্রেতা কোন ফসলের

মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত নির্বাচিত এলাকায় ব্যবহৃত কীটনাশকের তালিকা

১. টারটার ১.৮ ইসি মূল উপাদান: এবামেকটিন প্রস্তুতকারক: কৃষি রসায়ন, ভারত বাংলাদেশে পরিবেশক: মামুন এগ্রো প্রোডাক্টস লি. প্রয়োগক্ষেত্র: তুলা(এফিড, জ্যাসিড ও বোলওয়ার্ম) ও চা(লাল মাকড়) সতর্কতা: ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ক্ষেতের ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : বেগুনক্ষেতের জন্য	২. শার্পার ৫ ডব্লিউডিজি মূল উপাদান: এমামেকটিন বেনজয়েট প্রস্তুতকারক: এগ্রোহাও কো. লি., চীন বাংলাদেশে পরিবেশক: ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট লিমিটেড প্রয়োগক্ষেত্র: তুলা(বোলওয়ার্ম) দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : সব ধরনের সবজির জন্য	৩. হোয়াইট ওয়াশ ৪০ ডব্লিউজি প্রতি কেজিতে আছে ২০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান এমামেকটিন বেনজয়েট ও ২০০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম প্রস্তুতকারক : জিয়াংসু হোস ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন লি., চীন বাংলাদেশে পরিবেশক : এমা গ্রিন কেয়ার প্রয়োগক্ষেত্র: ধান(মাজরা পোকা) সতর্কতা: ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান, সবজি, বিশেষ করে বেগুনে
৪. ফুরাডান ৫ জি দানাদার কীটনাশক/নেমাটোডনাশক প্রতি কেজিতে আছে ৫০ গ্রাম কারবোফুরান প্রস্তুতকারক: FMC কর্পোরেশন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস গ্রুপ, ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক: পদ্মা অয়েল কোম্পানি লি. সতর্কতা : ব্যবহারের ৩০ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান ও সবজিতে	৫. অক্সিকব মূল উপাদান : কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০ ডব্লিউপি একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ছত্রাকনাশক প্রস্তুতকারক: গোল্ডচান্স ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি., চীন বাজারজাতকারক : মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লি. প্রয়োগক্ষেত্র : আলুর মড়ক রোগ দমনের জন্য দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : সব ধরনের সবজিতে সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ	৬. ল্যামিক্স ২৪.৭ এসসি মূল উপাদান: থায়ামেথোক্সাম ১৪.১%+ ল্যামডাসাইহ্যালোথ্রিন ১০.৬% প্রস্তুতকারক : নিংবো সিন এগ্রোকম কো. লি., চীন পরিবেশক : এসিআই ব্যবহার : সব ধরনের সবজিতে সতর্কতা : ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ
৭. ক্রপসেপ ৩০০ এসসি মূল উপাদান :15% Difenoconagole+ 15% Propiconazone প্রস্তুতকারক : গোল্ডচান্স ইন্ডাস্ট্রিজ কো. লি., চীন বাজারজাতকারক : মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লি. ব্যবহার : মরিচ, ধান, কলা সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ	৮. হেরাজল ৫ ইসি মূল উপাদান : হেক্সাকোনাজল প্রস্তুতকারক : হনবর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো. লি., চীন আমদানি ও বাজারজাতকারক : করবেল ইন্টারন্যাশনাল লি. ব্যবহার : শিম, শসা, কুমড়া সতর্কতা : ব্যবহারের ৭ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : লাউ, কুমড়া, শসাসহ সব ধরনের সবজিতে	৯. লিস্টার ২.৫ ইসি প্রতি লিটারে আছে ২৫ গ্রাম ল্যামডাসাইহ্যালোথ্রিন প্রস্তুতকারক : রেফুল হোল্ডিং কোম্পানি লি., চীন বাজারজাতকারক: নেচার অ্যান্ড কেয়ার এগ্রো প্রোডাক্টস লি. প্রয়োগক্ষেত্র:আলুও ভুট্টা(কাটুই পোকা), আম(হপার) চা(চায়ের মশা), পাট(বিছা পোকা) সতর্কতা: ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের আগে ফসল তোলা নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : শিম ও কলা চাষে
১০. সেমকাপ ৫০ ইসি (অর্গানোফসফরাস) প্রতি লিটারে আছে ৫০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান ফেনথোয়েট প্রস্তুতকারক:প্যানচেম ইন্ডাস্ট্রিজ পিটিই লি., সিঙ্গাপুর বাজারজাতকারক : সেমকো প্রয়োগক্ষেত্র : ফল ছিদ্রকারী মাছি সতর্কতা: ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : সব ধরনের ফল ও সবজিতে, কাঁচামরিচ	১১. টাফগর ৪০ ইসি মূল উপাদান : ডাইমেথয়েট প্রস্তুতকারক : র‍্যালিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড, ভারত পরিবেশক : অটো ক্রপ কেয়ার লি. প্রয়োগক্ষেত্র: ধান(পামরি পোকা), আল(জাব পোকা) চা(মশা), শিম ও সরিষা(জাব পোকা),আম(হপার) সতর্কতা: ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ। কীটনাশকের ব্যবহৃত খালি বোতল ভেঙে নষ্ট করে মাটির অন্তত ১০ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : আলু, শিম, সরিষায় বেশি, তবে অন্যান্য ফসলেও ব্যবহার করা যায়	১২. করটিন ৬ ডব্লিউডিজি মূল উপাদান: এবামেকটিন ২%+এমামেকটিন বেনজয়েট ৪% প্রস্তুতকারক : এগ্রোহাও কো. লি., চীন পরিবেশক : করবেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড প্রয়োগক্ষেত্র : বেগুন(এফিড) সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল তোলা নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : বেগুন চাষে
১৩. সানটাপ ৫০ এসপি প্রবহমান কীটনাশক মূল উপাদান : প্রতি কেজিতে ৫০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান কারটাপ আছে প্রস্তুতকারক : সুনদাত এস (প্রা.) লি., সিঙ্গাপুর বাজারজাতকারী : ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রা.) লি. প্রয়োগক্ষেত্র : ধান(পামরি পোকা,বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, মাজরা পোকা), বেগুন(ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা) দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান ও শাকের জন্য	১৪. এরোক্সন ২০ এসএল উপাদান : প্যারাকোয়াট; প্রতি লিটারে ২৭৬ গ্রাম প্যারাকোয়াট আছে প্রস্তুতকারক : পেনজেন ইন্ডাস্ট্রিজ কো. লি., চীন বাজারজাতকারী : মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লি. প্রয়োগক্ষেত্র : চা(সকল প্রকার আগাছা) সতর্কতা: স্প্রে করার ১৪-২১ দিন ফসল তোলা যাবে দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধানক্ষেতের আগাছা দমনে	১৫. গ্রেট-জল ৫ ইসি উপাদান : হেক্সাকোনাজল তরল ছত্রাকনাশক। প্রতি লিটারে ৫০ গ্রাম তরল হেক্সাকোনাজল আছে প্রস্তুতকারক : এগ্রোহাও কোম্পানি লি., সাংহাই, চীন বাজারজাতকারক : নেচার অ্যান্ড কেয়ার এগ্রো প্রোডাক্টস লি., গাজীপুর প্রয়োগক্ষেত্র :ধান(সিথুবাইট),আম, (এনথ্রোকনোজ) সতর্কতা : ব্যবহারের ১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : কলা চাষে বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে যে কোনো ফল ও শাকসবজিতে ছত্রকনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়

১৬. সিনসাইপার ১০ ইসি উপাদান : প্রতি লিটারে আছে ১০০ গ্রাম সক্রিয় সাইপারমেথ্রিন প্রস্তুতকারক : সিনন কর্পোরেশন, তাইওয়ান বাজারজাতকারক:পেট্রোকম (বাংলাদেশ) লি., উত্তরা, ঢাকা প্রয়োগক্ষেত্র: তুলা(গুটি পোকা বা বোলওয়ার্ম) দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : যে কোনো সবজি ও ধানে	১৭. তুন্দ্রা ২০ এসপি উপাদান : অ্যাসিটামিপ্রিড প্রস্তুতকারক : র‍্যালিজ ইন্ডিয়া লি., ভারত পরিবেশক : অটো ক্রপ কেয়ার লি. প্রয়োগক্ষেত্র: তুলা(এফিড জেসিড ও সাদা মাছি) শিম(এফিড) সতর্কতা: ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : সব ধরনের সবজিতে	১৮. ক্যারাটে ২.৫ ইসি উপাদান:প্রতি লিটারে ২৫ গ্রাম ল্যামডাসাইহ্যালোথ্রিন প্রস্তুতকারক : সিনজেনটা নানটং এগ্রোকম কোম্পানি লি., চীন বাজারজাতকারক : সিনজেনটা বাংলাদেশ লি. প্রয়োগক্ষেত্র : আলু ও ভুট্টা(কাটুই পোকা), আম(হপার), পাট(বিছা পোকা), চা(চায়ের মশা) দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : কলা চাষে
১৯. বিস্টারন ৫ জি উপাদান : প্রতি কিলোগ্রামে রয়েছে ৫০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান কার্বোফুরান প্রস্তুতকারক : বিস্টারফেড সিমসুগুস ইন্টারন্যাশনাল, জার্মানি পরিবেশক : আলফা এগ্রো লি., কাকরাইল, ঢাকা ব্যবহারবিধি : আক্রান্ত ক্ষেতে ৯.৯০ কেজি/হেক্টর, আখক্ষেতে ১৫ কেজি/হেক্টর এবং চায়ের ক্ষেতে ১৬ কেজি/হেক্টর সতর্কতা : ব্যবহারের ৩০ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া যাবে না দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : যে কোনো ফসলে ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়	২০. রেকাজিনন ১৪ জি উপাদান : ডায়াজিনন ১৪% জি প্রস্তুতকারক : কিংতাই কেমিক্যাল কো. লি., চীন আমদানিকারক ও সরবরাহকারী : সিয়াম ক্রপ কেয়ার, রামপুরা, ঢাকা দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান ও সবজিতে সতর্কতা : ব্যবহারের ২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ	২১. ফিনিস ইনসেক্ট পাউডার বাজারজাতকারক : স্ট্যান্ডার্ড ফিনিস অয়েল কো., ইউনিট-২, গাজীপুর, বাংলাদেশ প্রয়োগক্ষেত্র : পোকামাকড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : বেগুনক্ষেতে ব্যবহার করতে দেখা গেছে
২২. উইড গার্ড ৫০০ ইসি উপাদান : প্রতি লিটারে ৫০০ গ্রাম প্রেটিলাক্লোর আছে প্রস্তুতকারক : সারদা ওয়ার্ল্ডওয়াইড প্রাইভেট লি., ভারত বাজারজাতকারক : মামুন এগ্রো প্রোডাক্টস লি., ধানমণ্ডি, ঢাকা প্রয়োগক্ষেত্র : ধানক্ষেতের আগাছা দমনে সতর্কতা : প্রয়োগকৃত ক্ষেতে স্প্রে করার ১০ দিনের মধ্যে গবাদি পশুপাখি ঢুকতে বা ফসল খাওয়া যাবে না। খালি পাত্র বা বোতল ভেঙে নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং অন্তত ১০ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে	২৩. টিল্ট ২৫০ ইসি উপাদান : প্রতি লিটারে আছে ২৫০ গ্রাম প্রোপিকোনাজল প্রস্তুতকারক : সিনজেনটা ক্রপ প্রোটেকশন এজি, ব্যাসল, সুইজারল্যান্ড প্রয়োগক্ষেত্র : ধান (সিমুবাইট), গম (ব্লাস্ট), মরিচ (এনথ্রাকনোজ), পান (লিফ স্পট) সতর্কতা : টিল্ট শেষ প্রয়োগ ও ফসল তোলার মধ্যে ধানে ২৮ দিন ও অন্যান্য ফসলে ৭ দিন ব্যবধান রাখা উচিত দোকনদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান, শাকসবজি, ফলে	২৪. ট্রেসার ৪৫ এসসি উপাদান : স্পিনোসাড ৪৫% এসসি প্রস্তুতকারক : ডও এগ্রোসাইন্স ইন্ডিয়া প্রা. লি. পরিবেশক : অটো ক্রপ কেয়ার লি. প্রয়োগক্ষেত্র : বেগুন(ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা), তুলা(বোলওয়ার্ম) সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : বেগুন ও অন্যান্য সবজি, কুমড়া জাতীয় সবজিতে
২৫. সাহার ৮০ ডব্লিউডিজি উপাদান:অতি সূক্ষ্ম গন্ধক (Sulphur) কণাসংবলিত ছত্রাক ও মাকড়নাশক প্রস্তুতকারক : জয়শীল সালফার অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ভারত বাজারজাতকারক : ইনতেফা, ৪৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ প্রয়োগক্ষেত্র : পাট(হলদে মাকড়), চা(লাল মাকড়) লাউ, কুমড়া, শসা, ক্ষীরা, পাউডারি মিলডিউ ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, করলা, পটল কাঁকরোল ও তরমুজ সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ বা খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : যে কোনো ধরনের শাকসবজিতে	২৬. এমিরাক্সন ২০ এসএল উপাদান : ২৭.৬% প্যারাকোয়েট বিদ্যমান প্রস্তুতকারক : শেনঝেন কুইনফেং পেস্টিসাইড কো. লি., চীন বাজারজাতকারক : এমিন্যান্স কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি. প্রয়োগক্ষেত্র : চায়ের আগাছা দমনে দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধানের আগাছা দমনে	২৭. পাইরাস ১০ ডব্লিউপি উপাদান : পাইরাজোসালফিউরান-ইথাইল প্রস্তুতকারক : ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশন বাংলাদেশ বাজারজাতকারক : এমিন্যান্স কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি. প্রয়োগক্ষেত্র : ধানের আগাছা দমনে সতর্কতা : স্প্রে করার ৭-১৪ দিনের মধ্যে ক্ষেতে মানুষ, হাঁস-মুরগি ও গৃহপালিত পশু প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না

২৮. অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ৫৬% উপাদান : ৩৩% w/w Phosphine বিদ্যমান প্রস্তুতকারক : অ্যাসটেক লাইফ সাইন্স লি., ভারত রেজি. হোল্ডার: ইন্টিগ্রেটেড কর্প সলিউশন বাংলাদেশ প্রয়োগক্ষেত্র: ধান(রেড গ্রেইন বিটল) ব্যাবহার নির্দেশিকা: প্রতি ১০০০ কেজি তে ৪ টি টেবলেট । দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : প্রতি বস্তায় অর্থাৎ ৫০ কেজিতে ২টি ট্যাবলেট	২৯. এমিথ্রিন প্লাস ৩% ডাবিউডিজি উপাদান : প্রতি কিলোগ্রামে ১০ গ্রাম এমাবেকটিন ও ২০ গ্রাম বেটাসাইপারমেথ্রিন আছে প্রস্তুতকারক : শেনঝেন কুইনফেং পেস্টিসাইড কো. লি., চীন বাজারজাতকারক : এমিন্যান্স কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি. প্রয়োগক্ষেত্র : চা(হেলোপেলটিস), ধান(মাজরা), শিম(লেদাপোকা) সতর্কতা : ব্যবহারের ২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান ও যে কোনো ধরনের সবজিতে	৩০. দামদামা ৪৪০ ইসি উপাদান : প্রোফেনোফস+সাইপারমেথ্রিন প্রস্তুতকারক : শেনঝেন কুইনফেং পেস্টিসাইড কো. লি., চীন পরিবেশক : ইনতেফা প্রয়োগক্ষেত্র :শিম(জাব পোকা) সতর্কতা : ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া যাবে না দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : জালি, কুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, শিমে
৩১. চেনজার ১৮ ডাবিউপি উপাদান : এসিটাক্লোর ১৪% + বেনসালফিউরন মিথাইল ৪% প্রয়োগক্ষেত্র : ধানক্ষেতের আগাছা দমনে ব্যবহৃত হয় বাজারজাতকারক : এমা গ্রিন কেয়ার, ঢাকা, বাংলাদেশ	৩২. আশামিল ৭২ ডাবিউপি ছত্রাকনাশক উপাদান : মেনকেজেব ৬৪%+মেটানেক্সিল ৮% প্রস্তুতকারক : সুমিল কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লি., ভারত বাজারজাতকারক : মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লি. দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : শাকসবজিতে	৩৩. ইন্ডোফিল এম ৪৫ স্পর্শক্রিয় ছত্রাকনাশক উপাদান : প্রতি কেজিতে ৮০০ গ্রাম ম্যানকোজেব আছে প্রস্তুতকারক : ইন্দোফিল ইন্ডাস্ট্রিজ লি., ভারত পরিবেশক : অটো ক্রপ কেয়ার লি. প্রয়োগক্ষেত্র : আলু, পেঁয়াজ, আম । ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে সতর্কতা : উলেখ নেই দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : যে কোনো ধরনের শাকসবজিতে
৩৪. মর্টার ৪৮ ইসি উপাদান : প্রতি লিটারে ৪৮০ গ্রাম সক্রিয় ক্লোরোপাইরিফস আছে প্রস্তুতকারক : সিনোকেম এগ্রো কো. লি., চীন বাজারজাতকারক : ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট লি. প্রয়োগক্ষেত্র : তুলা, বরবটি, ধান, আলু, চা সতর্কতা : ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান ও সব ধরনের সবজিতে	৩৫. জবাত ২৫ ডাবিউজি উপাদান : প্রতি কেজিতে ২৫০ গ্রাম সক্রিয় থায়ামেথোক্সাম বিদ্যমান আছে প্রস্তুতকারক : দেবীদয়াল (সেলস) লি., ভারত বাজারজাতকারক : মামুন এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড, ঢাকা প্রয়োগক্ষেত্র : ধান, সরিষা, চা সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল তোলা নিষেধ দোকানদারর বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : সরিষা, বিভিন্ন ধরনের সবজিতে	৩৬. ইমিটাফ ২০ এসএল উপাদান : ইমিডাক্লোপ্রিড প্রস্তুতকারক : র‍্যালিজ ইন্ডিয়া লি., ভারত পরিবেশক : অটো ক্রপ কেয়ার লি. প্রয়োগক্ষেত্র : ধান, তুলা, চা, আখ সতর্কতা : ব্যবহারের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া নিষেধ দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : ধান, বেগুনে
৩৮. ডারসবান ২০ ইসি উপাদান : ক্লোরোপাইরিফস প্রস্তুতকারক : ডাও এগ্রো সাইন্সেস ইন্ডিয়া ট্রেড মার্ক অব ডাও এগ্রো সাইন্সেস, আমেরিকা পরিবেশক : অটো ক্রপ কেয়ার লি. প্রয়োগক্ষেত্র : ধান, আলু, চা, আখ, তুলা সতর্কতা : ব্যবহারের ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া যাবে না দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : আলু, আখ, ফুলকপি, বেগুন, ধান চাষে	৩৯. সিথিয়ন ৫৭ ইসি উপাদান : ম্যালাথিয়ন প্রস্তুতকারক : জিয়াংসু হনজি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কো. লি., চীন পরিবেশক : সিয়াম ক্রপ কেয়ার প্রয়োগক্ষেত্র : ধানের পামরি পোকা ও চায়ের হেলোপেলটিস মশা দমনে খুবই কার্যকর দোকানদার বিক্রি করেন এবং কৃষক ব্যবহার করেন : যে কোনো ফসলের সব ধরনের পোকামাকড় দমনে	

জন্য সেটি বিক্রি করছেন এবং কৃষক তা ব্যবহার করছেন।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল

অধিকাংশ কীটনাশকেরই গায়ে লেখা রয়েছে কিছু সতকর্তা, যেমন–স্বাদ ও গন্ধ নেওয়া, শরীরে লাগানো এবং স্প্রে করার সময় ধূমপান ও পানাহার করা নিষেধ। বাতাসের বিপরীতে বা খালি গায়ে স্প্রে করা নিষেধ। স্প্রে করার সময় উন্নতমানের মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। মানুষ ও পশুখাদ্য থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে তালাবদ্ধ করে রাখুন। ব্যবহার শেষে খালি বোতল নষ্ট করে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলুন। স্প্রে করার একটা নির্দিষ্ট সময় (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৭-১৪ দিন, কোনো কোনো ত্রে ১৪-২১ দিন) পর্যন্ত ফসল তোলা ও খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। স্প্রে করার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্ষেতে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর প্রবেশ নিষেধ। কীটনাশক স্প্রে করার পর হাত ও কাপড় সাবান দিয়ে ভালো করে ধুতে হবে এবং সাবান দিয়ে ভালো করে গোসল করতে হবে।

বিভিন্ন কীটনাশকের বোতলে লেখা এসব সতর্কবাণী পড়লেই বোঝা যায় কতটা ভয়ংকর বিষ এসব বোতলে আবদ্ধ। আমাদের প্রতিদিনকার খাদ্যতালিকায় থাকা বিভিন্ন শাকসবজি ও ফলে ব্যবহৃত হচ্ছে এসব বিষ, যা খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে আমাদের দেহে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য কিছু ফলাফল হলো–

ক) কীটনাশক স্প্রে করার সময় সতকর্তা মানছেন না অধিকাংশ কৃষক। প্রায় ৮২.৬৭ শতাংশ (১২৪ জন) কীটনাশক স্প্রে করার সময় নিরাপত্তা মাস্ক অথবা ভালো সুতি কাপড় অথবা গামছা দিয়ে ভালো করে মুখ বেঁধে স্প্রে করেন না। স্প্রে করার সময় কেউই নিরাপত্তা মাস্ক ব্যবহার করেন না। বাকি ১৭.৩৩ শতাংশ কৃষক হয় সুতি কাপড় অথবা গামছা দিয়ে মুখে বেঁধে স্প্রে করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেরই বমি বমি ভাব, শরীর চুলকানো, পেট ব্যথা প্রভৃতি বিষক্রিয়ার উপসর্গ দেখা দিলেও তাঁরা তা আমলে নেন না এবং দীর্ঘ মেয়াদে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাকসবজিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন নারীরা এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৮৯ শতাংশই নিরাপত্তা মাস্ক অথবা সুতি কাপড় অথবা গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে কীটনাশক স্প্রে করেন না। যার ফলে নারী কৃষক রয়েছেন অধিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে।

আবার পুরুষ কৃষকদের মধ্যে অনেকেই খালি গায়ে স্প্রে করেন এবং শতভাগ কৃষকই হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করেন না। সেই সাথে নিরাপত্তার জন্য চশমা ও পা ঢাকার কোনো কিছুই কেউ ব্যবহার করেন না।

খ) প্রায় ৯৭.৩৩ শতাংশ (১৪৬ জন) কৃষকই কীটনাশক ব্যবহারের পর কীটনাশকের খালি বোতল ও কাগজ নষ্ট করে মাটিতে পুঁতে রাখেন না বা ভালোভাবে নষ্ট করেন না। কেউ কেউ ব্যবহারের পর জমির আশপাশেই ফেলে রাখেন, আবার অনেকেই বাড়িতে রেখে দেন। মাঠপর্যায়ের জন্য নির্বাচিত এলাকাগুলোর কয়েকটি পুরনো টিন-লোহা-বোতল ক্রয়ের দোকানে কীটনাশকের বোতলের স্তূপ দেখা গেছে। কীটনাশকের এসব খালি বোতল দিয়ে ভেজাল বা অবৈধ বা চোরাপথে আসা নিম্নমানের বিষাক্ত কীটনাশক বিক্রির আশঙ্কা রয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে এ বিষয়ে কোনো তদারকি নেই।

গ) কোন ফসলে কোন কীটনাশক কতটুকু পরিমাণে দিতে হবে কৃষক তা জানেন না। কৃষক তাঁর ফসলের সমস্যা নিয়ে কীটনাশকের বিক্রেতার কাছে যান এবং তাঁকে সমস্যা খুলে বলেন। তারপর কীটনাশক বিক্রেতা কৃষকের সমস্যা শুনে যে কীটনাশক দেন কৃষক সেটাই ব্যবহার করেন। সেটা ব্যবহার করে যদি ভালো ফল পান তাহলে ঐ কৃষক পুনরায় এসে ঐ কীটনাশকেরই খোঁজ করেন, আর ভালো ফল না পেলে এসে বলেন–*'কি ওষুধ দিছেন, কোনো কামই করে না'*। তখন বিক্রেতা নতুন করে আরেকটি কীটনাশক দেন অথবা কৃষক অন্য কোনো বিক্রেতার কাছে যান। এভাবেই চলছে। আবার অধিকাংশ দোকানদারই প্রকৃতপক্ষে ফসলের ডাক্তার নন। কোন কীটনাশকের কী কাজ তা তাঁরাও ভালো জানেন না। দোকানদার মূলত কীটনাশক বিক্রি করছেন বিভিন্ন কীটনাশক কোম্পানির লোকজনের কথামতো। কোম্পানির লোকজন দোকানদারদের তাঁদের কীটনাশক পৌঁছে দিচ্ছেন এবং বলে দিচ্ছেন এটা ধানের জন্য, এটা সবজির জন্য, এটা কলার জন্য, এটা বেগুনের জন্য। সুতরাং দোকানদাররা কোন ফসলের জন্য কোন কীটনাশক বিক্রি করছেন এবং কৃষক ব্যবহার করছেন সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে কোম্পানির লোকজন সেই কীটনাশকটা কোন ফসলের জন্য বলেছেন তার ওপর।

ঘ) চা ও তুলার জন্য প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন উচ্চমাত্রার কীটনাশক বিষ শাকসবজি বা ফলে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কীটনাশক যে ফসলের যে রোগের জন্য তৈরি সেই ফসলে সেই রোগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না। সব ধরনের কীটনাশকই এমনকি কার্বোফুরান, অর্গানোফসফরাসের মতো কীটনাশকও সবজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঙ) অধিকাংশ কীটনাশক ব্যবহারের পর ৭-১৪ দিন এবং ১৪-২১ দিনের মধ্যে ফসল তোলা ও খাওয়া নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে তা ঘটছে না। বেগুনে কীটনাশক স্প্রে করার ২-৩ দিনের মধ্যেই তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য শাকসবজির ক্ষেত্রে ৪-৬ দিন। বিশেষ করে যখন বাজারে দাম ভালো থাকে তখন পর্যাপ্ত সময় পার হওয়ার আগেই শাকসবজি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভিটামিনের নাম করে সব ধরনের শাকসবজিতেই ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হরমোন; যার ফলে কম সময়েই পুষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফসল। কুমড়া জাতীয় ফসল, যেমন–লাউ, মিষ্টি কুমড়া, জালি, সেই সাথে টমেটো, শসা, বেগুন, কাঁকরোল, করলা, মরিচ প্রভৃতি ফসলের অধিক ফলন ও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণে হরমোন ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে কম সময়ে ফসলের বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় কীটনাশকের প্রয়োগকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ফসল

বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

চ) কীটনাশকের প্রয়োগবিধি মানছেন না কোনো কৃষকই। কৃষকদের মাঝে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ধারণা হলো–কীটনাশক বেশি প্রয়োগ করলে কোনো ক্ষতি নেই, বরং দোকানদার যে পরিমাণে প্রয়োগ করতে বলেন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োগ করাই ভালো। অধিকাংশ কীটনাশকের ক্ষেত্রে একবার প্রয়োগ করার কথা থাকলেও কমপক্ষে ৪-৫ বার কীটনাশক স্প্রে করছেন কৃষকরা। বেগুনের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ২-৩ বার স্প্রে করছেন নিয়মিত। অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে প্রায় সব কৃষকই জানান, দোকানদার যে মাত্রায় প্রয়োগ করতে বলেন সেই মাত্রায় প্রয়োগ করলে লাভ হয় না, পোকা মরে না; তাই বেশি প্রয়োগ করেন। আবার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পরই নতুন করে পোকা দেখা যায়, তাই আবার স্প্রে করতে হয়। কৃষকদের অভিযোগ, কীটনাশক ঠিকমতো কাজ করে না, তাই তাঁরা বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করেন। চারজন কৃষক পাওয়া গেছে, যাঁরা বেগুনে পোকামাকড় মারার ফিনিস পাউডার ব্যবহার করেন। তাঁরা জানান, কোনো কীটনাশকেই কাজ না করায় একদিন ফিনিস পাউডার প্রয়োগ করে ফল পেয়েছেন। তার পর থেকে ফিনিসই ব্যবহার করছেন। কৃষকদের ধারণা, যেটি দিয়ে কাজ হয় সেটিই ভালো কীটনাশক। কিন্তু সেটি যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন। আর দোকানদারও সুনাম ও ভালো বিক্রির জন্য অধিক মাত্রার বিষাক্ত কীটনাশক বেশি বিক্রি করছেন।

ছ) কৃষক নিরুপায় হয়েই অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করছেন। কৃষকরা তাঁদের ফসলের একটা অংশ নিজেরাও খেয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা নিজের হাতে বিষ খাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁদেরকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্যই অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। যত দিন কৃষকের হাতে বিকল্প ব্যবস্থা না পৌছাবে তত দিন তাঁদের এভাবেই চলতে হবে আর আমাদের খেতে হবে বিষে ভরা খাদ্য।

উপসংহার

ধান উৎপাদনের জন্য কৃষকদের কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীলতার সুযোগে এগ্রো কেমিক্যাল কোম্পানিগুলো পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং শিল্পোন্নত বিশ্বে নিষিদ্ধ কীটনাশক বাংলাদেশে আমদানি ও বাজারজাত করছে। তা ছাড়াও প্রতিবছর ভারত থেকে চোরাপথে আসছে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক, যেগুলো পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের উদ্যোগে ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৫৮০টি কীটনাশকের রাসায়নিক পরীক্ষা পেস্টিসাইড ল্যাবরেটরিতে সম্পন্ন করা হয় এবং রাসায়নিক পরীায় প্রাপ্ত ৮০টি তিকর বালাইনাশক তাৎণিকভাবে বাজার থেকে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয় (আহম্মেদ, ২০১৩)। কিন্তু এই ৮০টি ক্ষতিকর কীটনাশক কত দিন ধরে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে? এর কারণে মানবদেহে কী পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে? কোন কোম্পানি এসব বিষাক্ত কীটনাশক আমাদানি ও বাজারজাত করেছে? তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তরই নেই। বাংলাদেশে কীটনাশকের বার্ষিক বাজার প্রায় ১২৫০ কোটি টাকার, যা বাংলাদেশ সরকার চলতি অর্থবছরে কৃষকদের কাছ থেকে যে দামে ধান কিনছে সেই দামে প্রায় ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টন ধানের সমতুল্য (ফারুক, ২০১৫)।

কীটনাশকের দাম ও ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে কৃষকদের উৎপাদন খরচ, সেই সাথে অনেক বেশি বাড়ছে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়। কীটনাশকের কারণে আমাদের দেহে কী কী সমস্যা হচ্ছে, কী কী রোগ হচ্ছে, এসব রোগের চিকিৎসা করতে আমাদের কত টাকা ব্যয় হচ্ছে, বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় অর্থনীতিতে এর প্রভাব কতটুকু, পরোভাবে কতজন মৃত্যুবরণ করছে প্রভৃতি বিবেচনায় নিলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কতটা ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার। এমনকি অপার সম্ভাবনা থাকলেও পৃথিবীর অনেক দেশের বাজার ধরতে পারছে না বাংলাদেশের কৃষিপণ্য শুধুমাত্র মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে। কীটনাশকের সামগ্রিক ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে দেশীয় বীজের ব্যবহারের মাধ্যমে এই ক্ষতি অনেকাংশেই লাঘব করা যায়। কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জৈব ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পোকা দমনে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য বরাদ্দ দিতে হবে এবং দেশীয় বীজের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। দেশের কয়েকটি স্থানে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে যাঁরা সফলতা পেয়েছেন তাঁদের পদ্ধতি সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ইসতিয়াক রায়হান: শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল : istihakshuvo@gmail.com

তথ্যসূত্র

[আহম্মেদ, ২০১৩],আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ: "কৃষিতে বালাইনাশকের ব্যবহারঃ সংকটে মানবস্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র", মাসিক কৃষিবার্তা, সেপ্টেম্বর।

[এগ্রো নিউজ, ২০১০] AgroNews: Pesticide use in Bangladesh tripled in 10 years, Sep 22, 2010, Available at http://news.agropages.com/News/NewsDetail---3862.htm, Accessed on 12 October 2015.

[ইটিসি গ্রুপ, ২০০৮] ETC group: Who Owns Nature? Corporate Power and the Final Frontier in the Commodification of Life, November, 2008, Available at http://www.etcgroup.org/files/publication/707/01/etc_won_report_final_color.pdf Accessed on 12 October 2015.

[ফারুক, ২০১৫] আ ব ম ফারুক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা: ২৮, ০১ আগস্ট ২০১৫

[মুহাম্মদ, ২০১৪], আনু মুহাম্মদ: "খাদ্য- সর্বজনের অধিকার ও বিশ্ব সাম্রাজ্য", সর্বজনকথা, নভেম্বর ২০১৪